এমনও বরষা ছিলো সেদিন

সরকার কবিরউদ্দিন

হয়। মানুষ এরকমও হয়। আবার অন্য রকমও হয়।

বাবা বলতেন, আশির্বাদময় জীবন সেটা যেখানে য়্যু হ্যাভ দ্যা এক্সপেরিয়েন্স অব মিটিং পিপল উইথ্ ডিফ্রেন্ট পয়েন্টস্ অব ভিউ।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়েই মনে পড়লো শাহেদের, কোথায় যেন পড়েছিলো, সঠিক করে মনে নেই; ভাসা ভাসা মনে আছে। পূর্ণিমার রাত ছিলো। আলোর বন্যায় ভেসে ছিলো তাবৎ পৃথিবী। রাজ্যময় সুখী আর অনুযোগ-হীন প্রজাগণ। রাজমহলে সোনায় মোড়া পালঙ্কে সুখনিদ্রা যায় তৃপ্ত যুবতী স্ত্রী, পাশে শুয়ে স্বাস্থ্যবান পুত্র সন্তান। রানী মহামায়ার একমাত্র সন্তান সিদ্ধার্থ, গৌতম বৌদ্ধ, ঊনত্রিশ বছর বয়সে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে, সব মোহ ত্যাগ দিয়ে চলে গেলেন অসীমের কাছে। না পাওয়া উত্তরের কাছে, না দেখা জীবনের কাছে। শাহেদের মনে হলো, ওর এখনকার অনুভূতি, সিদ্ধার্থের সেই চলে যাওয়ার বোধটাকে ছুঁতে পারছে।

রয়েল প্রিন্স আলফ্রেড হসপিটালের স্পেশালিষ্ট সেন্টার থেকে বের হয়ে শাহেদ লক্ষ্যহীন, একা অনুভব করতে থাকলো। মিসেনডেন রোড এবং ক্যেরীলন এ্যভিনিউ'র মোড়ে দাঁড়িয়ে ঠিক করতে পারছিলো না কি করবে এখন। তির তির করা বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে শরীর।

শীতের সকাল; ঠিক সকাল নয়, পৌনে এগারোটা বেজেছে। আসি আসি শীত, বাতাসের শীত শীত আবেশ এখনো সকালের অনুভূতিটা ধরে রেখেছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো শাহেদ। অনেক বর্ণীল ক্যেরীলন এ্যভিনিউ। রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথ ঘেঁষে সারি সারি মেপল গাছ। নানা বর্ণের পাতা নিয়ে বর্ণময়, সবুজাভ হলুদ, হলুদাভ কমলা, লাল, কালচে লাল।

শাহেদের কেবলই মনে হয় কার কারণে, কিসের জন্য এতোসব আয়োজন। পাকা-কালো ঘন চুলের ভেতর দু'হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে বিলি কাটলো সামনের থেকে পেছন-মুখী, ঘাড় বেয়ে নামিয়ে আনলো। এভাবে নিজের অজান্তেই করলো বার কয়েক। চুলগুলো ঠাণ্ডা।

স্থির হচ্ছে না মনটা। কিন্তু কোন ঢেউ নেই, বিচলন নেই, বিচলিত নয়। নিজেকে কুড়িয়ে জড়ো করার একটা অসফল চেষ্টা করলো শাহেদ। বর্ণীল মেপল গাছের ফাঁক গলে মাঝে মাঝে সিডনী ইউনি'র লালচে বনেদী দালানগুলো দেখা যাচ্ছে।

এতো বর্ণময়, এতো ঘটমান সবকিছু, এতো জীবন্ত মুহূর্তগুলোর মাঝেও চারিদিকে বৈরাগ্যের রং। সাধারণ মানুষের কারণহীন জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝের কী অদ্ভুত আর অসীম এই পার্থিব জীবন যাপন। কী বিস্ময়কর, কিন্তু খানিকক্ষণের। বড্ড রস বোধ সৃষ্টিকর্তার। চার ধারে এই যে এত সৃষ্টি তাঁর, কোথায় যায় এই সবকিছু? নাকি কোথাও যায় না।

শাহেদের হঠাৎ মনে পড়লো, তখন ও ঢাকায়, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে পড়তো, একবার নীলক্ষেতের মোড়ে, পড়ন্ত দুপুরবেলা, বিকেলের আগের ক্ষণটাতে এক কুষ্ঠরোগাগ্রস্থ মধ্যবয়স্কাকে ভিক্ষা করতে দেখেছিলো। ওর দু'হাত ভরা ছিলো সস্তা কিন্তু ঝলমলে, নানা বর্ণের কাঁচের চুড়ি, ঝলমলে বর্ণময়।

ডাক্তার এইভাবে শুরু করেছিলেন, ‘হ্যালো শাহেদ, কেমন আছেন?’
‘আমি ভালো, ধন্যবাদ জিজ্ঞেস করার জন্য। আপনি কেমন?’
স্টিভ বললো, ‘নট্ এ্য ভেরী গুড স্টার্ট অব দ্যা ডে’।
শাহেদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ব্রেন স্পেশালিষ্ট স্টিভ মার্টিনের দিকে তাকায়। মৃদু কণ্ঠে জানতে চায়, ‘আমার রিপোর্টগুলো কি এসেছে আপনার হাতে?’
‘হ্যাঁ’।
‘কি বলেছে রিপোর্টে?’
আধেক খেয়াল করেছেন, স্টিভ এমন একটা ভান ধরে বললেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরবার পথে, গাড়ীতে, টক-ব্যাক রেডিও শুনছিলাম; তার থেকে একটা দর্শনের কথা আপনাকে বলি’।
শাহেদ মৌন থাকে। স্টিভ মার্টিন যে সময়টা চাচ্ছেন, সেটা ও দেয়।
স্টিভ বলতে থাকেন, ‘এক কিঞ্চিত মদ্যপ, ফুরফুরে মস্তিস্কের যুবকের সাথে তার এক বন্ধুর পথে দেখা। যুবকটির এক পায়ে স্যান্ডেল দেখে বন্ধুটি জিজ্ঞেস করে, “কিরে, অন্য-পাটি স্যান্ডেল হারিয়ে ফেলেছিস?”
যুবকটি উত্তরে বলে, “নারে এই-পাটি স্যান্ডেল আমি পথে পেয়েছি”।
কি অদ্ভুত দেখুন। আমরা তাই দেখি, যেভাবে আমরা ভাবি, যা আমরা দেখতে চাই’ বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।
‘এটা কী হলো?’ শাহেদ জিজ্ঞেস করে।
‘হোয়াট ড্যু য়্যু মিন?’
‘অর্থাৎ, দর্শনের কথা বললেন; অথচ এমন একটা হাসি হাসলেন, যা মানুষ জোকস্ বলে হাসে’।
মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে পরাজয়ের ভঙ্গিতে বললেন, ‘হ্যাঁ, গতকালই রিপোর্টগুলো আমার হাতে এসেছে। এবং আমি পড়ে দেখেছি’।
‘কি বলেছে রিপোর্টে?’
‘গ্লীওব্লাসটোমা মালটিফর্মের সম্পর্কে কিছু জানেন?’
‘না’।
‘কখনো শুনেছেন কিছু?’
‘না’।
ছোট্ট একটা বিরতির পর বললেন, ম্লান এবং বিষণ্ন কণ্ঠে, ‘গ্লীওব্লাসটোমা মালটিফর্মে একটি এ্যাগ্রেসীভ ধরনের ব্রেইন টিউমার। দুঃখজনক ভাবে এর থেকে সেরে ওঠা এখনও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধরার মধ্যে নয়’।
শাহেদ স্টিভের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখে চোখে তাকানো নয়। স্টিভ জানলা দিয়ে বাহিরটা দেখছেন, আর শাহেদ দেখছে স্টিভের বলাটা।
‘বিশ্বব্যাপী মেনে নেয়া হয়েছে সীমিত ক’বছরের মানব জীবন এই এ্যাগ্রেসীভ ধরনের ব্রেন টিউমারের সঙ্গে’।
‘সেরে উঠবার সম্ভাবনা.....’ শাহেদ জানতে চায়।
‘আ’ম স্যরি শাহেদ ইসলাম’।
‘আমার কাছে কতটুকু জীবন আছে?’
‘আমি অংকে ভীষণ কাঁচা, আমার যদি ভুল না হয়, তবে চোদ্দ মাস’।

একটা শীতল কাঁচের মত মসৃণ নীরবতা পর শাহেদ স্টিভের কাছে জানতে চায়, ‘আমার এখন কী করার আছে?’

‘পুল য়্যু’র সক্সস আপ শাহেদ। ওই যে জানতে চাইলেন, আপনার কাছে কতটুকু জীবন বাকি আছে! এর কি কোন পরিমাপ আছে? জার্নিটা ঠিক করুন, দেখবেন পরিমাপ পেয়ে গেছেন’। শাহেদের জিজ্ঞাসার চোখ বিরতিহীন অনড়।
‘ওয়েল, প্যেলীয়েটিভ কেয়ারে যেতে পারেন। আপনি সম্মতি দিলে আমি ব্যবস্থা আরম্ভ করতে পারি’।
‘প্যেলীয়েটিভ কেয়ারটা কী?’ শাহেদ জানতে চায়।
‘প্যেলীয়েটিভ থেরাপি সাধারণত পরিমাপ করা জীবনের যাপনকে সহজ এবং উন্নত করে। কখনও কখনও বেঁচে থাকাটা কিছুটা দীর্ঘতর করে দেয়’।
‘এছাড়া আর কী করার আছে?’
‘প্রচলিত চিকিৎসার মধ্যে ক্যিমোথেরাপী, রেডিয়েশন-থেরাপি, রেডিও-সার্জারি রয়েছে’।
শাহেদ আবারও বিরতিহীন অনড় চোখে স্টিভের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত ম্লান আর অস্পষ্ট হাসে। হেসে বলে, ‘এবার আমি একটা গল্প বলি, টক-ব্যাক রেডিও’র গল্প নয়, আমার চোখে দেখা গল্প। আমার এক কলিগ, ট্যেরী, আমাদের প্রতিষ্ঠানের টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার, অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ স্বীয় পেশায়, এদেশের হাতে গোনা কয়েকজনের একজন। বছর দু’য়েক আগে ট্যেরীর জন্মদিনে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স অফিসার, দারুণ সুন্দরী মহিলা। মেদহীন শরীর, নিটোল উন্নত-বক্ষা জুলিয়ানা, ট্যেরীকে, সকালে অফিসে, এক গোছা সবুজাভ সাদা লিলির তোড়া দিলে, অফিস ফ্লোরের সকলে মৃদু তালির গুঞ্জনসহ একযোগে গেয়ে ওঠে, “হ্যাপী বার্থ-ডে টু য়্যু.....”।
আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ট্যেরী যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলো, তা ছিলো, “এগুলোর শিকড় কই?”
জুলিয়ানার অহংময় মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ওর সমস্ত আয়োজন ফিকে পড়ে যায়। শারীরিক অহংকার নুয়ে যায়। ট্যেরীর এই কনসার্নে আমি অবাক হয়ে যাই! ভেবে দেখেন স্টিভ, এমন মানুষ হয়? .....’।
স্টিভ হেসে ফেলেন, বলেন, ‘হয়। মানুষ এরকমও হয়। আবার অন্য রকমও হয়। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনি পেরেক না হয়ে হাতুড়ী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। য়্যু নেইল্ড ইট্’।
শাহেদ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। স্টিভের বাস্তব উপস্থিতি ভুলে গিয়ে বলতে থাকে, ‘আমি পরে, অন্য একদিন এসে আপনার সাথে কথা বলবো। আমার একটু সময় প্রয়োজন। আমি আপনাকে জানাবো। এই মুহূর্তে আমার নিজেকে জড়ো করা দরকার। এলোমেলো নিজেকে গোছানো দরকার’।
স্টিভ জানতে চায়, ‘একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবো? আপনি কি চালিয়ে এসেছেন?’
শাহেদ ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, ‘আপনি হয়তো আমাকে একটা সাহায্য করতে পারেন’।
‘সেটা কী?’
‘আমার গাড়ীটা আপনাদের স্পেশালিষ্ট সেন্টারের কার-পার্কে রইলো। আমি পরে এসে নিয়ে যাবো। এখন আমি একটু হাঁটতে চাইছি’।
‘আই ক্যান টেক কেয়ার অব দ্যাট। আমি নীচে, রিসেপশনে বলে দিচ্ছি। যাবার পথে প্রিপেইড ডে-পাসটা সংগ্রহ করে নেবেন’।
‘ধন্যবাদ’। বলে শাহেদ বেরিয়ে আসে ডাক্তারের চেম্বার থেকে।

মেপল গাছের বর্ণময় ঝরাপাতা বিছিয়ে আছে ক্যেরীলন এ্যভিনিউ’র রাস্তার ওপর। যতদূর দেখা যায়, বিছিয়ে আছে। ঝরাপাতার ভিন্ন ভিন্ন রঙের মিশ্রণ শাহেদের মনের ওপর থেকে ভারী-বোধটাকে সরিয়ে দিলো অনেকটা। কিন্তু শাহেদ ক্যেরীলন এ্যভিনিউ ধরে হাঁটল না। রাস্তাটা মোটামুটি নির্জন, পায়ে হাঁটা মানুষ খুবই কম। কোলাহলে যেতে ইচ্ছে হলো। মিসেনডেন রোড ধরে নিউটাউনের দিকে হাঁটতে থাকলো। নিউটাউনের কিং স্ট্রীট ভীষণ প্রাণবন্ত। জনময়, রাতই কী অথবা দিন। মনটা কাঁপতে থাকে। প্রিয় শহরটার জন্য কষ্ট হতে থাকে। মনকে আর কতটা পাহারা দিয়ে রাখা যায়। সবকিছু থাকবে, যেমন আছে তেমনি থাকবে, যেখানে আছে সেখানেই থাকবে শুধু আমি থাকবো না, এইটা ভেবে কষ্ট হতে থাকে শাহেদের।
এমনই একটা জীবন কাটিয়ে দিলো শাহেদ যেখানে সমুদ্র সৈকতের বালির মতো কোন বন্ধনই গেঁথে থাকলো না দীর্ঘ সময় ধরে। এই জীবনের যাপনটা পর্যন্ত নয়। কতই বা বয়স হয়েছে এখন। রূপাকে যখন বিয়ে করেছিলো, স্বপ্নময়

চোখ ছিলো রূপার, আর ছিলো যৌবন জড়ানো ভালোবাসার কাছাকাছি কিছু একটা, মোহময়। ভালোবাসার কাছাকাছি এই সম্পর্কটাকে শাহেদ তার দাম্পত্য জীবনের বৃহৎ একটা অংশে শুধুই শুভ পরিণয় ধরনের ভালোবাসা ভেবে তৃপ্ত হয়েছে, প্রশান্তি পেয়েছে। সময় বয়ে গেছে, মেঘ ঝরে প্রবাহিত হয়েছে, পরিপূর্ণতার সাগরে চলাচল। শাহেদ-রূপার সংসারে পাভেল এবং রাসেল এসেছে।

নিয়তি ছিলো, এক অভিযোগহীন রোদেলা ঝলমল দিন পেরিয়ে, বিকেলে শাহেদ রূপার সঙ্গে, এয়ারপোর্টে, রূপার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সময়কার বন্ধু কামরানকে আনতে গেলো।

কামরানের কানাডায় চলে যাওয়া ছিলো শাহেদ রূপার বিয়ের বছর-খানেক আগে। যুবক বয়সের হিসেব-হীন সমীকরণ, ওই শীতের দেশটাকে ভালো লেগে যাওয়ায়; অবিরাম প্রকৃতি, ঘনত্ব-হ্রাস জনবসতি, কামরান থেকে যায় কানাডায়। স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার নিশ্চয়তা দরকার ছিলো। আর প্রয়োজন ছিলো নতুন ভাবে পাওয়া শীতের জন্য শারীরিক উষ্ণতা। বিয়ে করে ফেললো রেনাটাকে।

শাহেদ রূপার কাছে এই সব গল্প শুনেছে।

কামরান ওই ব্রাজিলিয়ান মেয়েটার সঙ্গে ছিলো প্রায় বছর পাঁচেক। ওদের পাঁচ বছরের সংসারের স্বাক্ষর ছিলো একটি কন্যা। কন্যাটির নাম শাহেদ জানে না। রূপা কখনো বলেনি।

আর মুদ্রার ওপিঠে; শাহেদের জ্ঞানের বাইরে, অজান্তে, শাহেদের সাথে বসবাস রূপার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। আত্মীয়-স্বজনহীন, বন্ধুবান্ধব ছাড়া এই শহর, সিডনীর নবজীবন, একাকী কাটানো দিন শেষে রাতগুলো, এবং উর্বর বয়সের ওজন কিংবা জোয়ার; কামরানকে মুছে দিয়েছিলো রোদে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত কাঠের দরজার বিবর্ণ রঙের মতো। রোদের তীব্রতা তো এমনই হয়।

কামরানের হিসেব না করা সমীকরণ, সমীকরণ-হীন পাঁচটা বছরের জীবনটাকে অর্থহীন মনে হলো কামরানের নিজের কাছেই হঠাৎ একদিন। রেনাটার প্রতি মোহটা কেঁটে গেলো। কন্যাটির জন্য হৃদয় স্নেহহীন হয়ে পড়লো। হয়। মানুষ এরকমও হয়। আবার অন্য রকমও হয়।

বসন্তের জানান দেয় গাছের শাখায় শাখায় ফুল, ফুলের সৌরভ। যাপিত জীবনের এমন কিছু মোড় থাকে, ফেলে দেয়া অনুভূতি অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে যায়। যেমনটা রূপা হয়ে উঠেছিলো কামরানের কাছে, ওই বসন্তে।

পরের বছর, শীতে, সেই অভিযোগহীন রোদেলা ঝলমল দিন পেরিয়ে, বিকেলে শাহেদ রূপার সঙ্গে, এয়ারপোর্টে কামরানকে আনতে গেলো।

টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টের কারপার্কে এসে শাহেদ খেয়াল করলো, আকাশে মেঘ জমছে ঘন হয়ে। বাড়ী পৌঁছবার আগেই হয়তো বৃষ্টি আসবে। রূপা আর কামরান সেটা খেয়াল করেনি। ওরা ওদের হারানো পাঁচ বছরের জীবন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিতে জড়িয়ে ছিলো।

কেউ দেখেনি, খেয়াল করেনি, শুধুমাত্র নিয়তি দেখেছে, আবডাল-আড়াল থেকে। শাহেদ এক'দু পা পেছনে হাঁটছিলো। কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা পরাজিত হয় না, শুধুই সঙ্গ ছেড়ে দেয়, দিয়ে থাকে। বাঁধন খুলে ফেলে।

কামরানের দক্ষিণায়নের দিন এভাবেই শুরু হবার কথা ছিলো। কামরান রূপা-শাহেদের লিভারপুলের বাড়ীর গেষ্টরুমে উঠলো।

শাহেদের কোন ভূমিকা ছিলো না, ও তো এসবের অংশ ছিলো না। কিছু বলার ছিলো না, কারণ বলবার মত কথা মনে আসেনি। কিছু করার ছিলো না, ঘটমানতার বিপরীতে কিছু করা যায় না। শুধু ছিলো ভীষণ একটা তীক্ষ্ণ ধারালো আর অস্পষ্ট অবচেতন বিকর্ষণ।

ওদের বাড়ীতে নামিয়ে শাহেদ গেলো গ্লেনফিল্ডে, আনোয়ার হোসেনের বাড়ী থেকে ছেলে দু'টোকে আনতে। একা, হিউম হাইওয়ে ধরে গাড়ী চালাচ্ছিলো। ভাল লাগলো বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পেরে। বুকটা ভারী হয়েছিলো, অকারণে, ভারটা ছেড়ে গেলো। আনোয়ার হোসেন বন্ধু মানুষ। পাভেল এবং রাসেলের মতো আনোয়ার হোসেনেরও দু'টি ছেলে। সমবয়সী ছেলেদের বন্ধুত্ব এই দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের দ্বিতীয় কারণ ছিলো।

আনোয়ার চা খেয়ে যেতে বললেন, বসে যেতে বললেন। শাহেদ বসলো না। অকারণ কারণে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলো ছেলেদের নিয়ে।
রাতের খাবার পরেই শাহেদ শুতে গেলো। পাভেল আর রাসেল ঘুমিয়েছে আগেই।
রান্নাঘর গুছিয়ে কামরানকে শুভরাত্রি বলে শুতে গেলো রূপা। আর মনের জটিল কামরায়, এই প্রথম শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় রূপার মনে একটা অস্বস্তি খোঁচা দিলো। শাহেদকে অযাচিত পুরুষ মনে হলো।
কামরানের 'শুভরাত্রি' বলার সময়কার দৃষ্টিটা রূপাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলো।
গূঢ় অধিকারের চাওয়াটা তৈরি হলো তখন। নিয়তি ছিলো।
নিয়তির এই মঞ্চায়নের কিছুই শাহেদ জানতে পারেনি। ও ছিলো বাইরের। আউট-সাইডার।
অন্য একটা বিষয় শাহেদ জানতো না। সে রাতে অঘোরে বৃষ্টি হয়ে ছিলো।

শাহেদ যেদিন সত্যকে আবিষ্কার করলো, যেভাবে আবিষ্কার করলো, সেখান থেকে সবারই ফিরবার পথগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফেরার কোন উপায় থাকে না।
নিঃশব্দে শোবার ঘরের দরজা থেকে ফিরে এলো। রূপা শাহেদকে দেখেছে। রূপার শরীরের চূড়ান্ত উত্তেজনা পলকে নিভে যায়।
শাহেদ এসে কিচেনে ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ার টেনে বসলো। কতক্ষণ শাহেদ এইভাবে বসেছিলো, জানে না। এক সময় রূপা শব্দহীন পায়ে এসে ডাইনিং টেবিলের ওপাশটায় চেয়ারটা ধরে দাঁড়ালো।
শাহেদ রূপার চোখের দিকে না তাকিয়ে বুঝলো, রূপা ওর দিকে চেয়ে আছে। শাহেদ একটু ইতস্তত করে। মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। চোখ তুলে তাকায়। রূপার মুখখানা ফ্যাকাসে বিবর্ণ। শাহেদ অত্যন্ত স্থির অথচ নিচু কণ্ঠে বলে, 'অফিসে তেমন কাজ ছিলো না, তাই চলে এসেছিলাম। আমি স্যরি'।
ছোট একটা বিরতির পর আবার বলে, 'আমি পাভেল আর রাসেলকে স্কুল থেকে তুলে বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাবো। ওদের ফিরতে যদি একটু দেরী হয়ে যায় দুঃচিন্তা কোরো না। আমার কিছু কথা বলা দরকার ওদের সাথে। আর আপাতত আমি আনোয়ার হোসেনের ওখানে উঠবো। ওর স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে গেছেন'।
রূপার মুখখানা অসম্ভব বিবর্ণ।
'তুমি চাইলে পাভেল আর রাসেল আমার কাছে থাকতে পারে। তবে আমাকে ক'টা দিন সময় দিতে হবে। একটু গুছিয়ে নেই। একটা বাসা নেয়া প্রয়োজন'।
হঠাৎ অকারণেই রূপার চোখে পানি এসে যায়।
'আর একটা কথা, তোমাকে স্পর্শ করার ইচ্ছে আমার আর কখনও হবে না'।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছে। কিং স্ট্রীটের প্রায় শেষ মাথায়, ডাউন-টাউন থেকে আউট-বাউন্ড। কিং স্ট্রীট শেষ হয়ে মিশেছে প্রিন্সেস হাইওয়েতে। শাহেদ যেখানে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছে সেখান থেকে সিডনী পার্ক দেখা যায়। এই প্রিন্সেস হাইওয়ের কোষ্টাল রোড ধরে মেলবোর্ণ পর্যন্ত যাওয়া যায়। প্রায় এগারোশো কিলোমিটার। তাসমান সাগর, প্রশান্ত মহাসাগরের ধার ঘেঁষে এই পথে বেশ কয়েক বছর আগে মেলবোর্ণে গিয়ে ছিলো শাহেদ। রূপাকে ভেতর থেকে মুছে ফেলবার জন্য এই পথটুকু অতিক্রম করাটা জরুরী ছিলো। দু'সপ্তাহ ধরে পথে পথে থেমে মেলবোর্ণ পৌঁছে ছিলো। প্রয়োজনের অতিক্রমটা করতে পেরেছিলো।

প্রকৃতির কোল, এর বিশালতা, অবারিত শব্দহীন একাকীত্ব কখনো কখনো মানবিক দুঃখ-কষ্টের উপশম মলমের কাজ করে। নিজের কাছে ফিরে যাবার এ এক স্বর্গীয় উপায়। একটা আশ্রয় তৈরি করে দেয় এই চরাচরে।
প্রকৃতির কাছে আশ্রয় খুঁজবার এই অভ্যাসটা শাহেদের শৈশব থেকেই তৈরি হয়েছে। মায়ের কাছে থাকবার ইচ্ছেটা শাহেদের ছেলেবেলা থেকেই ক্ষুধার সাথে খাবারের সম্পর্কের মত। শৈশবে বাবার মৃত্যুর পর, নিয়তি ছিলো, হয়নি। মার আশ্রয় জুটে ছিলো তাঁর বোনের ছেলেপুলে ভরা সংসারে। আর শাহেদের ঢাকা অদূরে, জয়দেবপুরে, ছোট চাচার বাসায়। সেই থেকে মা-ছাড়া জীবনের চলাচল। বাবা বলতেন, 'খুব বেশী কিছু চেয়ো না জীবনে, লোকে তোমাকে ভিক্ষুক বলবে। নিজেকে ভিখিরি মনে হবে'। তাই শাহেদ অভিযোগ করেনি। করে কী লাভ, কারো শুনবার সময় কই। গুটি থেকে প্রজাপতির রূপান্তরের মতো মা ছাড়া মায়ের আশ্রয়টা খুঁজে নিয়েছে প্রকৃতির কাছে।
আকাশের দিকে তাকিয়ে এখনো মাঝে মাঝেই মাকে জিজ্ঞেস করে, আমি যে তোমাকে কি ভীষণ ভালবাসতাম, সেটা তো বুঝে যাওনি তুমি।
ফেরা দরকার। গাড়ীটা রেখে এসেছে ডক্টরস স্পেশালিষ্ট সেন্টারের কার-পার্কে। পকেট হাতড়ে দেখলো, পার্কিং প্রিপেইড ডে-পাসটা ঠিকঠাকই আছে। ঠিক তখনই শহরমুখী ৪২২ নাম্বারের বাসটা এসে থামলো। বাসস্টপে আর কেউ নেই। শাহেদ উঠে পড়লো। একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ ব্যথা বুকের ভেতরটা খামচে খামচে ধরছে। দুর্বল পড়ে যাচ্ছে মন। কি করবে শাহেদ এখন? পুরোপুরি উদ্দেশ্যহীন মনে হয় নিজেকে। ওপেনিং খুঁজতে থাকে এই উদ্দেশ্যহীনতার।
ঠিক করলো চেনা জীবন, অভ্যাসের শহর থেকে নিজেকে সরানো প্রয়োজন। মায়া মানুষকে দ্রবীভূত করে দেয়। নীল রঙ জড়ানো মায়াময় সংকলিত জীবন, মানুষজন ঝেড়ে ফেলা দরকার। ডঃ স্টিভ মার্টিনের দর্শনের জোকটা মনে পড়লো। গ্লাসের অর্ধেক শূন্যাংশ কোন অর্থ বহন করে না। যে আধেকটায় পানি আছে সেখানেই জীবনের স্পন্দন। শাহেদ বেরিয়ে পড়বে।
আজকে কামরান আর রেনাটার কন্যাটির নাম জানতে বড় বেশী ইচ্ছে করছে। কত বড় হয়েছে মেয়েটি এখন।
শাহেদ বেরিয়ে পড়বে। তবে কিছু গোছগাছ আছে। এটা ওটা সেটা। তেমন জরুরী কিছু নয়। আবার জরুরীও বটে। শাহেদ ভাবে, হয়তো সে নিজের ওপর কিংবা অন্যের ওপর বিরক্ত হতে পারে অথবা তৃপ্ত; এই জন্য যে, যেভাবে যাপিত হয়েছে জীবন। কিন্তু যখন একে ছেড়ে দেবার সময় আসে, তখন তা দিতেই হয়। চাকরিটা ছাড়তে হবে। বাসার বারান্দায়, কার্নিশে যে কবুতরটা বাসা বেধেঁ থাকে, ওর মায়াটা ছাড়াতে হবে। রূপার জন্য নয়, রূপার সঙ্গে কাটানো সময়ের যোগসূত্রগুলোর প্রতি অবোধ এক ভালবাসা রয়েছে। পাঁজর ভেঙ্গে যাবে, তবুও তা সমাপনে দায়ভার তো আছেই। ছেলে দু'টো, বিশেষ করে ছোট ছেলেটা, রাসেল, নীরব গাছের ছায়া, নিথর পানি। ছেলেটার কথা মনে পড়তেই, সেই গানটা মাথার ভেতরে বেজে যায়, 'ইফ্ য়্যু মিস্ দিস্ ট্রেন, আই'ম অন। য়্যু উইল নো দ্যাট্ আই হ্যাভ গন'। বাড়ীটা বিক্রি করে দেবে। ভীষণ প্রিয় ছিলো আর্লউডের পাহাড়ের উপর এই বাড়ীটা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এয়ারপোর্টে প্লেনের ওঠা নামা দেখা যায়। দেখা যায় এয়ারপোর্টের পাশেই সমুদ্র, ব্রাইটন-লী-স্যান্ডের বীচ, বীচের বালি। প্রচুর সবুজ চারপাশে। আর বিক্রি করে দেবে গাড়ীটা, শহুরে সিডান, এটার আর প্রয়োজন পড়বে না। বদলে একটা অফ-রোড এস.ইউ.ভি দরকার। সঙ্গে অফ-রোড উপযোগী একটা ক্যারাভেন। পুরোপুরি চলে যাবার আগে এস.ইউ.ভিটা পাভেলকে দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে যাবে; ছেলেটার বড্ড প্রিয়। আনোয়ার হোসেনের সাথে শেষ হাত মেলানোটা মেলাতে হবে।
হঠাৎ বাইরে তাকাতেই খেয়াল হলো, এসে গেছে। পরের বাসস্টপটাই ওর আপাতত গন্তব্য। শাহেদ বাস থেকে নেমে স্পেশালিষ্ট সেন্টারের দিকে হাঁটতে থাকলো মিসেনডেন রোড ধরে। বেলা পড়ে গেছে। একটু শীত শীত করছে।

এই বেধেঁ দেয়া জীবনের গল্পটা, সবার আগে শাহেদ বিস্তারিত জানালো আনোয়ার হোসেনকে। পদ্মপাতার ওপর পানির ফোঁটার মত, ওর হাতের তালুতে ধরে রাখা জীবনের পরিকল্পনার কথা বললো। শুনে পাথর হয়ে গেলেন আনোয়ার। এই পাথর হয়ে যাবার কারণে শাহেদ এক টানা ভাবে কথা বলতে পারলো। টানাময়তার জন্য আনোয়ার হোসেনও নিজেকে সামলে নিলেন।

শাহেদ আরো বললো, 'আনোয়ার, আমার এই অভ্যাসের জীবন ছেড়ে একা হয়ে যাবার সময়টা পর্যন্ত আপনি একটু কাছাকাছি থাকবেন। আমার ভীষণ প্রয়োজন। একটু হেলান দিতে পারলে আমার ভালো লাগবে। আমাকে গোছগাছ করাতে একটু হাত দেবেন'।

আনোয়ার উত্তর দিলেন না। মাথাটা নেড়ে সন্মতি দিলেন। ভাবলেন, জীবনটা আরও ছোটতর যতটা মানুষের ধারণায় আসে। জীবনটা তো ছোটাধিক ছোট।

শাহেদ জানতে চাইলো, 'কফি চলবে? করবো?'

আনোয়ার ম্লান হেসে সন্মতি দিলেন।

আনোয়ার হোসেনকে সমুদ্র-মুখী কাঠের ঝুল-বারান্দায় বসিয়ে রেখে শাহেদ কফি করতে গেলো। ঝুল-বারান্দা আর লিভিং-রুমের মাঝের কাঁচের স্লাইডিং দরজাটা খুলে রেখে সিডি প্লেয়ারটা চালিয়ে দিয়ে গেলো।

১৯৬৫ সালের আশা ভোঁসলের একটা হিন্দি গান বাজছে।

"আগে ভী জানে না তু
পিছে ভী জানে না তু
যো ভী হ্যায়
ব্যস য়্যেহী ইক্ পাল্ হ্যায়"।

আনোয়ার হোসেন কথা রেখেছেন। যখনই শাহেদ একটু হেলান দিতে চেয়েছে, তিনি পাশে থেকেছেন। পরের দু'টো মাস কেটে গেলো গোছগাছে। বাড়ীটা বিক্রি হয়ে গেলো। শাহেদ বেরিয়ে পড়ার দিনটা ঠিক করলো সেদিনটাতে, যেদিন বাড়ীটা ছাড়বে, বাড়ী বিক্রির শর্ত অনুযায়ী। ডিপার্টমেন্ট অব হিউম্যান সার্ভিসের সাথে অর্গান এবং শরীরের টিস্যু দান করে যাবার ইচ্ছের কথা বললো। ওরা প্রিয়জন বা কাছের মানুষজনকে ইচ্ছের কথাটা জানিয়ে যাবার গুরুত্বটা স্মরণ করিয়ে দিলো। চাকুরীটা ছেড়ে দিয়ে আসলো। প্রায় সকলেই নিঃশ্বাস গ্রহণের মতো, "ইট্ ওয়াজ নাইস নোয়িং য়্যু" বলে ঘটনাটা গ্রহণ করলো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে, ট্যেরী ভীষণ মন খারাপ করলো। বললো, 'তোমাকে বড্ড মিস্ করবো শাহেদ'।

স্যুপারএ্যান্উয়েশানের ফান্ডটা রাসেলকে নোমেনি করে দিলো। অত্যন্ত বাপ-ঘেঁষা ছেলে। একটা অফ-রোড ল্যান্ড-রোভার আর অফ-রোড উপযোগী কোরোমাল ক্যারাভেন কিনে ফেললো আনোয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে। ক্যারাভেনটা শাহেদের পছন্দ হয়েছে; সতেরো ফুট। কিচেনটা সামনের অংশে, চার বার্নারের চুলা, নয় কেজি গ্যাসের সিলিন্ডারসহ। থ্রি-ওয়ে ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ। ঠাণ্ডা গরমের সুবিধা নিয়ে সত্তুর লিটারের পানির ট্যাঙ্ক। এবং পছন্দ করবার মতো একটা কুইন সাইজের বিছানা। শাহেদের পছন্দ হয়েছে। মন সুখী হবার মত পছন্দ হয়েছে।

ক্যারাভেনটা কিনবার সময় একটা মজার ঘটনা ঘটলো। সব লেনদেন চুকিয়ে শাহেদ এবং আনোয়ার হোসেন যখন বেরিয়ে আসছে, তখন বিক্রেতা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'রিমেমবার, য়্যু আর অন হলিডেজ্, দ্যেয়ার ইজ নো রাশ'। শাহেদ কিছু বললো না, শুধু মৃদু হাসলো।

আর একদিন, মেঘলা বিকেলে, একটু বাতাস বইছিলো। বারান্দার কার্নিশে বাসা বেধেঁ থাকা কবুতরটার সাথে অনেকক্ষণ কথা বললো, অনেক কথা বললো। যে কথাগুলো মানুষের কাছে বলা যায় না, সে সব কথা বললো। শাহেদ জানে এই পাখিটি মানুষের ভাষা বোঝে না, তবুও যথেষ্ট আয়োজন করেও, পাখিটির কাছ থেকে বিদায় নেয়া হলো না। আর কথা বললো ফিউনারেল কোম্পানীর সঙ্গে। নিজের সমস্ত ছোট ছোট ইচ্ছেগুলো ব্যক্ত করলো শাহেদ। অত্যন্ত নীরবে যেতে চায়, ছেলে দু'টোর কাছে বোঝা হতে চায় না বিধায়, দাফন হয়ে যাবার পর ওদের সংবাদটা জানানোর কথা বলে গেলো। বেশ কয়েকটা ফিউনারেল কোম্পানীর সাথে কথা বলার পর এদের রীতি-জ্ঞান শাহেদের মনটাকে হালকা করে দিলো। শাহেদের মনে একটু খুঁতখুঁত ছিলো, এদেশে প্রধান প্রধান দু'একটা শহর ছাড়া মুসলমানি কায়দায় দাফনের ব্যবস্থা করা কঠিন। এরা বললো, একজন মুসলমানের দাফন যতটা শীঘ্র সম্ভব, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করা, ক্রীমেট যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, মরদেহকে গোসল করানো, যথাযথ ভাবে কাফন পরানো, জানাজা দেয়া, কবরে শোয়ানোর সময় মানুষটির মাথাটি যেন কেবলা-মুখী থাকে, এসব বিষয়ের প্রতি ওরা মনোযোগ দিয়ে থাকে সততার সাথে।

এর মাঝে একদিন ব্রেন স্পেশালিষ্ট স্টিভ মার্টিনের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে আসলো। ফর্মাল বিদায় নিয়ে এলো।

এক রোববার দুপুরে পাভেল আর রাসেলকে আসতে বললো, ওর সাথে লাঞ্চ করার জন্য। পাভেল এখন আর রূপার সঙ্গে থাকে না। স্কটিশ বংশীয় বান্ধবী, এমেলীকে নিয়ে ডলস্-পয়েন্টে থাকে। ল-ফার্ম, স্লেইটার এন্ড গোর্ডানে ভাল চাকুরী করছে। রাসেলটা এখনও মা'র সাথে থাকে। পাভেলকে ফোনে বললো, 'একটু ঘুর-পথ হলেও রাসেলকে নিয়ে

আসবে সাথে করে। আর কিছু মনে করো না। তুমি একাই এসো, এমেলীকে এনো না সঙ্গে করে। আমি শুধু তোমাদের দুজনকে রান্না করে খাওয়াবো'।
'বাবা, সিরিয়াস কিছু?'
'একথা বলছো কেন?'
'ওই যে বললে এমেলীকে না আনতে!'
'আমাদের বাবা ছেলেদের কিছু কথা থাকতে পারে না?'
'ঠিক আছে বাবা, আমি রাসেলকে নিয়ে আসবো'।

দুপুরের খাবার শেষে ওরা ঝুল-বারান্দায় বসলো।
শাহেদ এই ভাবে শুরু করলো। 'তোমাদের মনে আছে আমার কলিগ ট্যেরীর কথা? এই ট্যেরীর একটা ঘটনা বলি। একবার ওর স্ত্রী ওকে ফোন করে বললো, বাচ্চাদের স্কুল থেকে তুলতে। বাই দ্যা ওয়ে, ওদের তিনটা সন্তান। প্রতিদিন ওর স্ত্রীই বাচ্চাদের স্কুল থেকে আনেন। ওইদিন অফিসে অত্যন্ত জরুরী আনএ্যভয়েডেবল বোর্ড মিটিং থাকার কারণে তিনি পারছেন না। ট্যেরী অফিস থেকে টাইম-অফ নিয়ে বাচ্চাদের স্কুলে আনতে গেল।
যথারীতি স্কুলের গিয়ে বসে আছে। স্কুল ছুটি শেষে একে একে সব বাচ্চারা বাড়ী চলে গেল। ওর বাচ্চারা আর আসে না। কিছু সময় পার হওয়া পর ও স্ত্রীকে ফোন করে পরিস্থিতির কথা জানালো।
স্ত্রীতো স্বামীকে চেনেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কোন স্কুলের সামনে অপেক্ষা করছো?"
ট্যেরী স্কুলের নাম বললো।
স্ত্রী বললেন, "বাচ্চারা এই স্কুল বদলেছে তিন বছর আগে"।
হয়। মানুষ এরকমও হয়। আবার অন্য রকমও হয়'।
পাভেল অত্যন্ত কোমল স্বরে বলে, 'কি হয়েছে বাবা?'
'আমি যে তোমাদের ভীষণ ভাবে ভালবাসি এটা কি তোমরা বুঝতে পারো? তোমাদেরকে ভালোবাসাটা আমার হবি বা অভ্যাস নয়, প্রকৃতি কিংবা বিশ্বাস'।
এবার রাসেল জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে বাবা?'
'তোমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবার কারণে আমার ভেতর জন্মেছে এক অবোধ আর প্রবল ভালোবাসা তোমাদের জন্য। আজ বলবো কাল বলবো করে করে কোনদিন বলা হয়নি কথাগুলো। তোমাদের ছেড়ে দূরে যাবার বিষয়টা বড্ড শক্ত'।
রাসেলের হঠাৎ করে মনে পড়ে। ও ডক্টরের সাথে বাবার দেখা করার বিষয়টা জানতো। শঙ্কিত কণ্ঠে জানতে চায়, 'ডক্টরের কাছে গিয়েছিলে বাবা? কি বলেছে ডক্টর?'
ছোট ছেলেটার মায়া ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে শাহেদের মনটা ভেঙ্গে যায়। আবেগে গলে যেতে থাকে। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে।
ধীরে ধীরে বলে, 'য়্যু বয়েজ নিড্ টু বি লিটল্ স্ট্রং'।
এরপর.....,
স্যুপারএ্যান্উয়েশানের ফান্ডটা রাসেলকে নোমেনি করে দেবার বিষয়টা ওকে জানালো। ল্যান্ড-রোভারটা যে পাভেলকে পৌঁছে দেবে ফিউনারেল ডিরেক্টর, এটাও ওকে জানালো।
অরগ্যান ডোনেশানের কথাটা বললো। ওদের অনুমতি দেবার ব্যাপারটাও বললো।

এমনই হয়। আর্লউডের পাহাড়ের উপর বাড়ীটা ভীষণ প্রিয় ছিলো। চারপাশটা অবারিত খোলা। অনেক দূর দেখা যায়। দেখা যায় সমুদ্র, বীচের বালি। প্রচুর সবুজ চারপাশে। মনটা বিষণ্ন হয় শাহেদের। পরের মুহূর্তে মনে হয়, এই বাড়ীটাতে ওর আগেও কেউ থাকতো, ওর পরেও কেউ থাকবে, এমনই প্রকৃতি কর্ম। মন কেন বিষণ্ন হবে।
শাহেদের মনে পড়লো, বাবা বলতেন, 'খুব বেশী কিছু চেয়ো না জীবনে, নিজকে ভিখিরি মনে হবে'।
রাতভর অঝোরে বৃষ্টি ঝরলো। সকালটা ঝকঝকে, ঝলমলে রোদে মাখামাখি।
ভীষণ সংগোপনে, নীরবে নিভৃতে শাহেদ পথে নামলো। কবুতরটার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলো না।
পথে নামতেই একটা কবিতা ঘুণপোকার মতো মাথার ভেতর বইতে থাকলো।

"……
ভালো থেকো মেঘ
মিটি মিটি তারা,
ভালো থেকো পাখি
সবুজ পাতারা
……
ভালো থেকো চিল
আকাশের নীল
……
ভালো থেকো রোদ
ভালো থেকো ঘাস
ভোরের বাতাস
ভালো থেকো,
ভালো থেকো"।

এফ-থ্রি, সিডনী-নিউ ক্যাসেল ফ্রী-ওয়েতে ওঠার পর, গাড়ীর স্পীডো মিটারের কাঁটাটা একশ দশ কিলোমিটারের দাগ ছোঁয়ার পর আবারো শাহেদের মনটা খারাপ হয়ে গেলো।
পাশের জানালা নামিয়ে দিলো খানিকটা। শীতল বাতাস এসে মুখটা ছুঁয়ে গেল। চুলগুলো বাতাসে কাঁপছে। পাকা-কালো ঘন চুলের ভেতর ডানহাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে বিলি কাটলো সামনের থেকে পেছন-মুখী নিজের অজান্তে।
ব্রুকলীন ব্রীজের ওপর থেকে বাম দিকে তাকালো। দেখলো, সূর্যের ঘন রূপালী আলো ছোট ছোট টুকরো হয়ে তিরতির করে কাঁপছে নদীর পানিতে। পিটস্ ফেরী রোডের বোট-রেম্পের পাশের ল্যাম্প-পোষ্টে একটা একাকী পেলীক্যেন্ বসে আছে।
মন স্থির করলো, এই জার্নির প্রথম থামাটা এখানেই থামবে। ফ্রী-ওয়ে থেকে বেরিয়ে এলো। নদীর পানিতে সূর্যের ঝিলমিল অত্যন্ত তীব্র। চোখে লাগে। তবুও ফোল্ডিং চেয়ারটা পানি-মুখী পাতলো। ফ্লাক্সটা বের করে আনলো। মগে ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে ধূমায়িত কফির সুগন্ধটা নাকে এসে লাগলো। এই চরাচরে একা হয়ে যাবার অনুভূতিটা আবছা করে ছুঁয়ে গেল শাহেদকে।
অনেকক্ষণ পর পেলীক্যেনটা উড়ে চলে গেলো।
আবার রওনা হবার তাগিদ অনুভব করলো। পরের বিরতিটা ঠিক করল, নিউ ক্যাসেল পেরিয়ে, ফস্টারের বীচে। রাতটা ওখানেই কাটাবে। শাহেদ আবার ফ্রী-ওয়েতে উঠলো। গাড়ীর স্পীডো মিটারের কাঁটাটা আবারও একশ দশ কিলোমিটারের দাগ ছুঁলো।
বড় মায়া এই পরিচিত চারপাশটার জন্য। মায়া হচ্ছে সঞ্চিত স্মৃতিগুলোর জন্য।

অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছিলো।

বিশ্বসংসারের যতদূর দেখা যায় সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। গাছের সবুজ পাতারা পানির ভারে নুয়ে আছে। পবিত্র দেখাচ্ছে।

পাভেল, রাসেল আর আনোয়ার হোসেন, ওরা তিনজনই ফিউনারেল ডিরেক্টরের কাছ থেকে অত্যন্ত সুন্দর হালকা নীলরঙের খামে চিঠি পেলো।

নীলরঙের খামের ভেতর একটু ঘন নীল কাগজে লেখা "চৌদ্দ এপ্রিল, বেশ ভোরের দিকে, শাহেদ ইসলাম চলে গেছেন ঘুমের ভেতর"।

রাত তখন আড়াইটা। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। রাসেল ঘুমোতে পারে না। মা'র ঘরের দরজায় টোকা দেয়, ডাকে, 'মা'।

কামরান দরজা খুলে জিজ্ঞাসার চোখে তাকায়। ঘুম জড়ানো চোখ, কিন্তু বিরক্ত নয়। ও জানে ছেলেটার মনটা বিষণ্ন, ভাঙ্গা।

রাসেল আবারও ডাকে, 'মা'।

কামরানের পেছন থেকে রূপা বেরিয়ে আসে, 'কিরে বাবা, কি হয়েছে? এতো রাতে কি হলো?'

পানি না দেয়া চারাগাছটার মতো লাগছে তার উনিশ বছরের এই ছেলেটাকে।

'মা, বৃষ্টিতে তো বাবা ভিজে যাচ্ছে'।

রচনাকাল ২০১২, সিডনী।